গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

ভারতীয় সংস্কৃতিতে শিব একটি বিশেষ চরিত্র। আর্যজাতির ভারতে আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিন্ধু সভ্যতা, দ্রাবিড় সভ্যতা, অস্ট্রিক সভ্যতা। প্রাক্ আর্য পর্বের সেই সকল সভ্যতাতেও শিব এক উজ্জ্বল চরিত্র। এরপর ভারতবর্ষে আর্যজাতির আগমনের পর রচিত হয় বেদ, সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদ। বৈদিক যুগের এই সকল সাহিত্যে শিব এক বিশেষ চরিত্র। বেদের পরবর্তী সময়ে রচিত হয় পুরাণ। প্রাচীন পুরাণসমূহে শিবের যে রূপ চিত্রিত হয়েছে, তা পূর্ববর্তী বৈদিক শিব চরিত্র থেকে খানিকটা হলেও পৃথক। বৈদিক যুগে শিব ছিলেন রুদ্ররূপী। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে শিবের রুদ্ররূপ ও যোগীরূপের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে অর্থাৎ প্রাক্ আধুনিক পর্বে যে সকল সাহিত্য রচিত হয়, সেখানে এক বলিষ্ঠ চরিত্র শিব। মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে শিব এক অপরিহার্য চরিত্র। প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডেই শিবের কাহিনী বিশেষ ভাবে স্থান লাভ করেছে। প্রাক্ আর্য পর্ব থেকে প্রাক্ আধুনিক পর্ব পর্যন্ত শিব কখনও উর্বরতার দেবতা, কখনও তিনি রুদ্র। আবার কোথাও তিনি যোগী, শান্ত সমাহিত। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এসে এই দেবতার দৈবী আবরণ খসে গিয়ে মানবায়ন ঘটেছে বলা যায়। এই শিব ভস্মভূষিত, শ্মশানবাসী, কামাচারী, বাঘছাল পরিহিত, সর্বাঙ্গে সর্পভূষণ, কোথাও তিনি কৃষক, আবার কোথাও বা তিনি ভিখারী। যদিও তিনি গৃহী, তবুও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, সংসারে তাঁর অনাসক্তি। এমনই চারিত্রিক গুণাবলী সম্বলিত শিব চরিত্র আমার গবেষণায় প্রতিভাত হয়েছে।

অসংখ্য দেবদেবীর মধ্যে শিবই একমাত্র দেবতা যিনি আসমুদ্র হিমাচলবাসী জনগণের মধ্যে অগ্রতম স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতীয়রা মনে-প্রাণে, শাস্ত্রে, সাহিত্যে, শিল্পে- মন্দিরে-মূর্তিতে স্থান করে দিয়েছেন শিবের। এই শিবকে কেন্দ্র করেই আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটেছে। আমার গবেষণার বিষয় 'বিবর্তনের ধারায় প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শিব চরিত্র', তবুও বৈদিক ও পৌরাণিক শিব চরিত্রের আলোকেই প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শিব চরিত্রকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে তুলে ধরেছি নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলিতে।

প্রথম অধ্যায় : বাংলা সাহিত্য-পূর্ববর্তী পর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে শিব চরিত্রের স্বরূপ। এই অধ্যায়ের আবার চারটি উপবিভাগ আছে। যেমন—

ক) বেদ

খ) রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত

গ) কালিদাস-কুমারসম্ভবম্ ও রঘুবংশম্

ঘ) পুরাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাক্ আধুনিক যুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে শিব চরিত্রের স্বরূপ
তৃতীয় অধ্যায় : প্রাক্ আধুনিক যুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে শিব চরিত্রের স্বরূপ
চতুর্থ অধ্যায় : প্রাক্ আধুনিক যুগের অপ্রধান বাংলা সাহিত্য ধারায় শিব চরিত্রের স্বরূপ।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে। সেই সময় থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কাল হল আর্য যুগ। এই সময় বেদ রচিত হয়েছিল বলে এই সময়কাল বৈদিক যুগ নামেও পরিচিত। বেদ গ্রন্থগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়— ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব। ঋক্‌বেদে রুদ্রকে প্রকৃষ্টজ্ঞান ও অভিষ্ট বর্ষণকারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ধনুর্বাণধারী, রথস্হিত, যুব পশুর মতো ভয়ঙ্কর। যজুর্বেদে রুদ্র হলেন পাপ-বিনাশক, পিনাকপাণি ও কৃত্তিবাস, অথর্ব বেদে তিনি সংহার কর্তা আবার জগৎপালকও তিনি। অথর্ব বেদের মহারুদ্রের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পরবর্তী পুরাণ ও মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যের শিব পরিকল্পনায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল বলা যেতে পারে। খ্রীষ্টপূর্ব সাত থেকে চার শতকের মধ্যে রচিত মূল তেরোটি উপনিষদেও শিব বা রুদ্র এক উল্লেখযোগ্য দেব চরিত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদে রুদ্র হলেন প্রাণস্বরূপ, বৃহদারণ্যক উপনিষদে তিনি গণদেবতা, আবার শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বরকেই শিব হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। পুরাণে শিবের রুদ্ররূপ ও যোগীরূপের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছিল। বর্তমানে শিব ঠাকুরের যে মূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি তা পৌরাণিক যুগেই উদ্ভুত। সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ ও মহাভারতে শিব হলেন ভক্তের ভগবান। কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভবম্ ও রঘুবংশম্ কাব্যে শিবকে একান্তভাবেই গৃহী পুরুষ রূপে অঙ্কন করেছেন। প্রাক্ বৈদিক, বৈদিক এবং পৌরাণিক— এই বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে প্রাক্ আধুনিক যুগে শিব হয়েছেন পুরোপুরি লৌকিক দেবতা, বিবর্তনের এই স্তরটিকেই প্রথম অধ্যায়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

প্রাক্ আধুনিক যুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যধারায় উল্লেখযোগ্য হল রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ, যা মূল সংস্কৃত ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছিল। সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত আদি কবি বাল্মীকি রচিত বিশাল মহাকাব্য রামায়ণকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। রামায়ণে ভগীরথের মর্ত্যে গঙ্গাকে আনয়ণের প্রসঙ্গে শিবের উল্লেখ আছে। কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে কার্তিক, গণেশ সহ স্ত্রী পার্বতীকে নিয়ে শিবের সুখী সংসারের কথা উল্লেখ করেছেন। শিব-পার্বতীর বিবাহ বিষয়ে এবং তাঁদের কোন্দলের বিষয়টি বড়ই উপভোগ্য। বাংলা মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হলেন কাশীরাম দাস। তিনি মহামুনি বেদব্যাসের সংস্কৃতে রচিত মহাভারতের বাংলায় অনুবাদ করেন। কাশীদাসী মহাভারতে সমুদ্র মন্থন প্রসঙ্গে শিবের উল্লেখ রয়েছে। ত্রিভুবনকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ‘অনাথের গতি’ ভূতনাথ মন্থনজাত বিষ পান করে ‘নীলকণ্ঠ’ হয়েছিলেন। মোহিনী

রূপধারী নারায়ণকে দেখে শিব তাঁর আলিঙ্গন পেতে 'ভার্য্যা-পুত্রগণ'-কে ত্যাগ করার কথাও ঘোষণা করেন। এমনকি নিজ বক্ষে ত্রিশূল মেরে আত্মঘাতীও হতে চান। কাশীরাম দাস তাঁর কাব্যে শিবের স্ত্রী হিসেবে গঙ্গা ও দুর্গা উভয়ের উল্লেখ করেছেন।

প্রাক্ আধুনিক পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য সমূহের মধ্যে প্রাচীন হল মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা। মনসামঙ্গল কাব্যের দেবখণ্ডে শিবের ঘর গৃহস্থালির বর্ণনা রয়েছে। শিব-সতীর বিবাহ, সতীর মৃত্যুতে শিবের দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ, পুনরায় হিমালয় কন্যা গৌরীকে বিবাহ, দুই পুত্র কার্তিক-গণেশকে নিয়ে তাঁদের সংসার যাত্রা, শিবের অলসতা, ভোজন রসিকতা, অসংযমী চরিত্র, কন্যা মনসার প্রতি চিরকালীন পিতার ন্যায় কর্তব্য পালন যেমন দেবখণ্ডের মূল বিষয়। মূল কাহিনী এক হলেও বিভিন্ন শতাব্দীর কবিরা তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে এই কাহিনী ব্যক্ত করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্য হল চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মূলতঃ কালকেতু ফুল্লরার দ্বারা মর্ত্যে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারের কাহিনী হলেও কাব্যটির দেবখণ্ডে শিবের গার্হস্থ্য জীবনের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। শিব-সতীর পৌরাণিক কাহিনী অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যের মতোই, কিন্তু হিমালয় কন্যা গৌরীকে বিবাহের পর শিবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিতান্তই লৌকিক কল্পনাজাত। সেখানে শিব ঘরজামাই হয়ে থেকেছেন হিমালয় গৃহে, জীবিকা গ্রহণে তাঁর অনীহা, তিনি ভোজন রসিক, কখনও তিনি ভিখারী, আবার সংসারের দারিদ্রতার কারণে স্ত্রীর সাথে কোন্দল করতেও বাঁধে না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও একটি উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা হল শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য। শিব কাহিনীর পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের সংমিশ্রণে শিবায়ন কাব্য রচিত। গৃহী শিবের লৌকিক জীবনকথাকে আশ্রয় করে পুষ্ট হয়ে উঠেছে শিবায়ন সাহিত্য ধারা। যদিও পুরাণের শিব, কাব্য থেকে পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। শিব-সতী সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনীর পর রয়েছে শিব-গৌরীর সংসার যাত্রার বর্ণনা। শিব গৌরীকে বিবাহ করে কৈলাস যাত্রা করেন। সংসার প্রতিপালনের জন্য অবলম্বন করেন ভিক্ষাবৃত্তি। তিনি অলস, নেশাখোর, ভোজন রসিক, কিন্তু শিবায়ন কাব্যে শিবের প্রধান পরিচয় তিনি কৃষক। আবার স্ত্রী গৌরী অভিমান করে পুত্রদের নিয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলে শাঁখারীর ছদ্মবেশে স্ত্রীর মানভঞ্জন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্য হল অন্নদামঙ্গল কাব্য। অন্নদামঙ্গল কাব্য দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম প্রচারমূলক কাব্য হলেও দেবী অন্নপূর্ণার স্বামী হিসেবে শিব এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কাব্যটির প্রথমাংশে শিব-সতীর পৌরাণিক কাহিনী ও শিব-গৌরীর সংসার যাত্রার লৌকিক কাহিনী উভয়ই স্থান পেয়েছে। কিন্তু কাব্যের শেষাংশে দেখা যায় শিব অন্নদার পূজা করেছেন অন্নের আশায়। পরিবর্তনশীল যুগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৃষ্ট দেবতাও প্রয়োজন অনুযায়ী বদলে যান যে পথ ধরে, সৃষ্টিকর্তা শিবও সেই একই পথ ধরে ভারতচন্দ্রের হাতে হয়েছেন ভিখারী শিব।

প্রাক্ আধুনিক যুগের অন্যান্য অপ্রধান সাহিত্য হল নাথ সাহিত্য ও শাক্ত পদাবলী। নাথ-সাহিত্য সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তর্গত। নাথপন্থীরা ছিলেন আত্মবাদী। তাঁদের আদিগুরু হলেন শিব, তিনি আদিনাথ নামে পরিচিত। নাথ ধর্মে যে নয় জন গুরুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শিব। নাথ ধর্মে শিবের স্ত্রী হিসেবে গৌরীর উল্লেখ আছে। নাথ সাহিত্য মূলতঃ গোরক্ষনাথের অদ্ভুত মহিমা প্রচারের কাহিনী, তাই সেখানে শিব প্রসঙ্গ এসেছে গৌণরূপে। শক্তি অর্থাৎ উমা-পার্বতী-দুর্গা-কালিকাকে কেন্দ্র করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল শাক্ত পদাবলী, শাক্ত পদাবলীর মধ্যে কিছু কিছু গানে উমার বাল্যলীলা ও হর-পার্বতীর কাহিনী স্থান লাভ করেছে, যা আগমনী ও বিজয়া গান নামে পরিচিত। পৌরাণিক যুগ কিংবা তারও আগে থেকে শিব চরিত্র বিবর্তিত হতে হতে প্রাক্ আধুনিক যুগে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে সেই অন্বেষণের ফলই আমার গবেষণায় তুলে ধরেছি।

প্রাগার্য যুগ থেকে প্রাক্ আধুনিক পর্ব পর্যন্ত শিব চরিত্র বিবর্তিত হতে হতে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, আমার গবেষণায় শিবের সেই রূপ ফুটে উঠেছে। বেদের রুদ্রদেব, পৌরাণিক যুগের ভক্তের ভগবান এবং প্রাক্ আধুনিক যুগের লৌকিক শিব বিবর্তিত শিব চরিত্রের প্রকৃষ্ট রূপ। প্রাগার্য যুগ থেকে প্রাক্ আধুনিক পর্ব পর্যন্ত শিব চরিত্রে যে বিবর্তন আমার অনুসন্ধানে উঠে এসেছে তার মধ্যে শিব চরিত্রকে স্পষ্টরূপে ফুঁটিয়ে তোলার প্রয়াস করেছি।